ঠাকুর পরিবারে এক ব্যতিক্রান্ত ছে
টগল্পকার সুধীন্দ্রনাথ

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯), জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজ সরল জীবনের মধ্যে জটিলতার যে দ্বন্দ্ব লুকিয়ে আছে তাকেই ছোটগল্পে প্রতিফলিত করেছেন প্রাঞ্জল ও গতিসম্পন্ন ভাষার মাধ্যমে। তাঁর ছোটগল্পের বই চারটি, মঞ্জুষা, চিত্ররেখা, করঙ্ক এবং চিত্রালি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দশ দশক পর্যন্ত হচ্ছে ছোটগল্পগুলির রচনার সময়কাল।

দু'একটি ছোটগল্পে সে সময়কার সুরেন বাড়ুজ্যের রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পেরেছে। বেশির ভাগ গল্পেই আছে গার্হস্থ্য জীবনের জটিল রহস্যময়তা। কোন কোন গল্পে সমাজ জীবনের সংঘাত বিদ্যুতের মতো চমক সৃষ্টি করেছে। তবে সহজ সরল পারিবারিক জীবনের স্নেহ ও বাৎসল্য তাঁর বেশির ভাগ গল্পকে প্রভাবিত করেছে। ইংরেজের অত্যাচার ও অপমানের দ্বন্দ্ব, জমিদারি চেতামর সাথে পিতৃত্বের দ্বন্দ্ব, ধর্ম ও জীবনের দ্বন্দ্ব এবং সমাজে ভদ্রেতর শ্রেণী দাস-দাসী ও ডাকাতের মানসিক অবস্থান ইত্যাদি গাল্পিক উপাদান পাই। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পগুলিকে শুধুমাত্র নিছক গল্প বলে সরিয়ে রাখা যায়া না। রীতিমতো তিনি একজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার ও গদ্য-শিল্পী। প্রতিটি ছোটগল্পে সুধীন্দ্রমাথ পরিমিত ভাষাবোধ ও চিত্রগল্পকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলেই তিনি একজন উল্লেখযোগ্য গদ্য-শিল্পী এখনও।

তাঁর 'খ্রীষ্টানের আত্মকথা' গল্পে ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। পরিবারের সুখী মধবিত্ত বাঙালি চাকুরিজীবী খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। সেই কারণে ভদ্রলোককে তার স্ত্রী পরিত্যাগ করে কলকাতায় পিত্রালয়ে চলে যান। এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা স্মরণীয়। একদিন তিনি পুত্রের উপনয়নের দিন স্ত্রীর কাছে উপস্থিত এবং সেখানে তিনি উপহাসিত হন। তখন বুঝতে পারেন যে তিনি সমাজ ছাড়া একাকী এবং নিঃসঙ্গ। এখানেই শু হয় মানসিক দ্বন্দ্ব। তিনি তার নিজের ধর্মের আশ্রয়ে মানসিক সান্ত্বনাও পাচ্ছেন না।

'রসভঙ্গ' গল্পে বনলোক বাড়ির দাসি লক্ষ্মীর হৃদয়ের দ্বন্দ্বই এই গল্পের ত্বিষা। দাসি লক্ষ্মী এক সময়ে বাল্যবিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিল তখন তার নাম ছিল মৃণালিনী। নতুন করে বাঁচার আশায় ধনীপুত্রের প্রেমের শিকার হয়েছিল। সেই দাসি লক্ষ্মীর মনোরঞ্জনের সদ্যবিবাহিত স্ত্রী প্রভাকে তার অতীত জীবনের ভালবাসার কথা বলতে বলতে তার প্রেমের অভিনয় করে ভুলিয়ে নিয়ে গেছিল বরানগরের বাগান-বাড়িতে যেখানে ধনীপুত্র পতিতাদের এনে আসর বসায়। তারপর একদিন সেই প্রণয়ী ধনীপুত্রটি লক্ষ্মীকে গলাধাক্কা দিয়ে বাগান-বাড়ি থেকে বের করে দেয় যখন আর একজন নারিকে শিকার করে আনে। আবশেষে সেই লক্ষ্মী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে প্রভার স্বামী মনোরঞ্জনই হচ্ছে তার অতীত প্রণয়ী এই বাড়িটিই বরানগরের বাগান-বাড়ি। এরকম আরো গল্প লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'বিচারক'লিখেছেন। সুবোধ ঘোষ 'বারবধু' লিখেছেন। কিন্তু কেউ লক্ষ্মীর মতো পুষের লাম্পট্যের মুখোস খুলে দিতে পারেন নি। সুধীন্দ্রনাথ পেরেছেন। আরও অবাক করে সুধীন্দ্রনাথের শিল্প কুশলতা যখন তিনি পৌরাণিক লক্ষ্মী নামটা মৃণালিনী বেশ্যায় পরিণত হওয়ার পর ব্যবহার করেছেন। এভাবে তিনি মিথ্‌কে অসারে পরিণত করেছেন।

''লাঠির কথা'' গল্পটি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার দন একশ্রেণী জমিদার ও বাঙালি ব্যক্তিত্বের ইংরেজ বিদ্বেষকে নিয়ে লেখা হয়েছে। ছোটভাই সমস্ত আত্মসাৎ করলে এক বৃদ্ধ নাবালক পৌত্র সতীশকে নিয়ে থাকে। একদিন সেই বৃদ্ধ ও সতীশ ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে । এক ইংরেজ বৃদ্ধকে 'ইউ ড্যাম নিগার' বলে সজোরে ধাক্কা মারলে সতীশ বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধের লাঠি দিয়ে ফিরিঙ্গির মাথায় সজোরে আঘাত করে। শহরের এক ধনীলোক এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে সতীশকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করে এবং সতীশকে পুরস্কার স্বরূপ সেই লাঠিটির মাথা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেন।

' স্নেহের জয়' গল্পে উল্লেখযোগ্য জমিদারি মনোভাবের সাথে পিতৃত্বের সংঘাত । গোপাল রায় শাঁখালির মস্ত জমিদার। তিনি তাঁর মতের বিদ্ধতা কোন মতেই সহ্য গরতে পারতেন না। যদি কেউ তাঁর মতের বিদ্ধতা করতো, তিনি তাকে ভিটেছাড়া করতেনই । মতের বিদ্ধতা করেছিল একজন। গোপাল রায়ের গরিব জামাতা বিধুভূষণ । এখানেই সংঘাত। মেয়েও বাবার অমতে এক বস্ত্রে চলে যায় স্বামী-গৃহে । অবশেষে পিতৃত্বের কাছে গোপাল রায়কে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

'সহধর্মিনী' গল্পে ধর্মীয় গুদেবের ভণ্ডামি উল্লেখযোগ্য । উপেন সম্পদশালী এবং বিবাহিত । সে সুখী । একদিন তার বন্ধু উপদেশ দেয় এই সুখ, সম্পদ, কামিনী, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা সবই মায়া এবং অনিত্য । স্মরণীয়, সে সময় সমাজে একশ্রেণী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন। এই প্রভাবের বিদ্ধে ধর্মীয় ভণ্ডামি দেখানো সুধীন্দ্রনাথের এক দুঃসাহসিক এবং প্রগতি-মানসিক সাহিত্য কর্ম। উপেন তারপর পার্থিব সকল মোহ ত্যাগ করে। অবশেষে একদিন উপেন দেখতে পেল তার উপেদেশ গু হঠাৎ মায়াবাদ ত্যাগ করে একটি স্ত্রীলোকের মায়াবদ্ধ । উপেনের কাছে তখন সহসা গীতাপাঠ, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ নিরর্থক বলে মনে হল। সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় সুন্দর ও সুখী জীবনের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল । কিন্তু পূর্বের সেই সহজ সরল জীবন উপেন পুরোপুরি ফিরে পেল না। কারণ এক সময় ম

য়াবাদী উপেনের অবহেলা উদাসীনতা সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রী ধর্মান্ধতাকে কৃত্রিমভাবে আঁকড়ে রইল। উপেনের স্ত্রী হয়তো সেই শিক্ষাই উপেনকে আমরণ দিয়ে যেতে চায়। এটাই গল্পের বাস্তবতা।

সুধীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় নারীর প্রতি সহানুভূতি, পুষের অবিচার ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। এর ব্যতিক্রমও আছে। 'ঠাকুর দেখা' গল্পে নায়িকা মঞ্জুভাষিণীকে দেখতে পাই স্বাধীন। পুষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের বিদ্ধে একুট বিদ্রোহ-শিখা। সে স্বামীর নিষেধ না শুনে স্বামীর পিসতুতো ভাই সতীশের সঙ্গে মেলামেশা করত। অসান্তি হলে সে চলে যায় বাপের বাড়ি। স্বামী ডেকে পাঠায়, আসে না। সাবামীর গু ডেকে পাঠায়, আসে না। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি সুধীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত মঞ্জুভাষিণীকে গৈরিক-বেশে সাধুতে পরিণত হওয়া সেই পূর্বের স্বামীর কাছেই নিয়ে যায় পুরীতে।

শিশু ও বালকদের নিয়ে সধীন্দ্রনাথ অনেক গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে 'পাড়াগেঁয়ে' ও 'কাসিমের মুরগী' উল্লেখযোগ্য। 'কাসিমের মুরগী' এক বড়লোক মুসলমান পরিবারকে নিয়ে লেখা। কাসিম সেই পরিবারে বিধবা মাকে নিয়ে থাকে কাকা আবদুল্লার সাথে। বাবা ছোটবেলাতেই মারা গেছেন। কাসিম পাখি ভালবাসত। মা কিনে দিলে সে দুধের মতো সাদা তিনটি মুরগি পুষতে শু করে। চামড়ার ব্যবসা করলেও অবদুল্লার ঘর অপরিস্কার হয় বলে মুরগি পুষতেন না। একদিন একদিন কাসিম দেখল তার দুটো মুরগি। সে অনেক খুঁজলো, কোথাও পেল না। ''হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ায়'' সে বুঝতে পারল। তখন সে বাকি দুটি বন্ধুর বড়িতে রেখে দিয়ে এল। কাকা মুরগি দুটিকে দেখতে না পেয় জিজ্ঞাসা করলেন 'মুরগীগুলো ককোথায়?' কাসিমের উত্তর, জানি নে। আহার বিলাসী কাকার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নেই বোঝা যায় কেন নি দরদ দিয়ে মুরগির খবর নিচ্ছেন। শেষপর্যন্ত কসিমের বন্ধু নিজের বাড়িতে বাখার অসুবিধা জানিয়ে মুরগি দুটো কাসিমের কাকার হাতেই ফেরৎ দিয়ে আসে। মুরগি দুটোর প্রতি পুনরায় আবদুল্লার খাওয়ার লোভ হয়। তিনি একটা মুরগিকে হত্যা করতে যায়। এমন সময় কাসিম চিৎকার করে, 'মেরো না কাকা। মেরো না। আমার পোষা মুরগী। দুটি পায়ে ধরি। আমাকে মারো কাকা.....।' এর পর সুধিন্দ্রনাথ লিখছেন, 'মুহূর্তে পক্ষীর অর্ধ ছিন্ন কণ্ঠ ঝুলিয়া পড়িল...। কাসিম ভূমিতলে মুর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।'

একই বস্তু কেউ ভালবাসে, কেউ হত্যা করে। আবদুল্লার ব্যবসায়ী মনোভাবকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 'তোমার যেমন ভালবাস, মুসলমানের মুরগী পোষা'- মুসলমান সমাজের প্রতি এই ঘৃণ্য প্রবাদটির মূলেও চরম কুঠারঘাত করেছেন সুধীন্দ্রনাথ কাসিমের এবং তার মায়ের চরিত্রটিকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

বালক মনের আরও একটি সার্থক রচনা 'পাড়াগেঁয়ে'। এ গল্পের বালক চরিত্র রমানাথ। রমানাথ গ্রামকে ভালবাসত। শহুরে চাকুরিজীবী মগেন্দ্রমাথের ছেল্কে জল তেকে বাঁচিয়েছিল বলে তিনি রমানাথকে মাসির কাছ থেকে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এলেন। এখানে সবাই রমানাথকে বোকা বলে ঠাট্টাকরে যেহেতু সে সত্য কথা বলে। একদিন তাকে ভুল বুঝে নগেন্দ্রনাথ চোর ভেবে প্রাহার করে। রমানাথ জ্বর নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে আসে। ভুল বুঝতে পেরে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় রমানাথকে ফিরিয়ে নিতে আসে। রমানাথ কিন্তু ফিরে যায় না। গ্রামে তার সন্ধ্যামণির গাছটির কাছে সে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। এই গল্পটির সাথে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের সাদৃশ্য আছে। 'ছুটি' লেখা হয়েছিল ১২৯৯-এ এবং এই গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৩১২ সালে। তের বছর পর। 'ছুটি' গল্পে বাস্তব পটভূমিকে ডিঙিয়ে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়েছে সেটা সুধীন্দ্রনাথের 'পাড়াগেঁয়ে' গল্পে পাওয়া যাবে না।

সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গল্পটি লিখে উচ্চ–শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সেই উল্লেখযোগ্য গল্পটির নাম 'চিত্ররেখা'। তবে তিনি এই গল্পে মানবিক সত্যকে জাতি বৈরিতা ও হত্যার উপরে স্থান দিয়েছেন। এক ইংরেজ বালিকার মমত্ব ও হৃদয়ের গভীরতাই এই গল্পে মৌলআশ্রয়।

সুধীন্দ্রনাথই প্রথম ছোটগল্পের গঠন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ডাইরির আকারে তিনি যে গল্পটি লিখেছেন তার নাম 'সন্তোষিণীর ডায়েরি'। বিভিন্ন দিনে লেখা ডাইরির সংকলন। ডাইরির মধ্যে কোন এক গৃহস্থ বধূর কয়েকটি দিনের তুচ্ছ ঘটনা সুন্দরভাবে বর্ণনা করে হয়েছে। 'দুঃখের বোঝা' গল্পটি সতীশ এবং তার বৌদির কয়েকটি চিঠি জোড়া দিয়ে বলা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে গল্পের এই প্রকার গঠন-রীতি এই প্রথম।

সুধীন্দ্রনাথ অচেতন পদার্থকে বিষয়বস্তু করে ছোটগল্পের গঠন নিয়ে পরীক্ষা ক রে দেখেছেন। এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'লাঠির কথা' এবং 'জুতার কথা'। বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের আগে এরকম গল্পের সন্ধান মেলে নি।

ভাষার চিত্রধর্মিতা আগে বংলা ছোটগল্পে সুধীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য অবদান, যথা, 'মুখে ডায়মন্ডকাটা বসন্তের দাগ, বাম পদে গজেন্দ্রচরণ দর্পহরী প্রকান্ড গোদ, নাকে সুদর্শন চত্র ঝুলিতেছে' বা 'এই সুন্দর পুলটিকে ঘেরিয়া, পুষভাবের কন্টকলতা বাড়িয়া উঠিয়াছিল।' অথবা সুধীন্দ্রনাথ ''রসভঙ্গ'' গল্পে লক্ষ্মীর অন্তরের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন চমৎকার প্রতীকের সাহায্যে, যথা, 'লক্ষ্মী অধর দংশন করিয়া কহিল, ''তবে শোন।'' হঠাৎ দশদিকের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া একটা বজ্র ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।'

সুধীন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর ছয়-সাত বড় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' ও 'ছুটি' গল্পের প্রভাব সুধীন্দ্রনাথ মুছে ফেলতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ সেখানে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বিচারক' গল্পের ভাষা সাধুভাষায় লেখা হলেও তৎসম শব্দের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে জটিল ও দুর্বোধ্য হয়েছে। গল্পের আন্তরিক ভাব ঢাকা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষীরোদা প্রতিবাদী নয়, বলিষ্ঠনয়, দূর্বল। সে শিক্ষিত মানু, জজ মোহিতমোহনের লাম্পট্যের বোঝা সারা জীবন বহন করে চলে, মানিয়ে নেয় এভাবেই একশ্রেণী গল্পকারেরা পাঠক-পাঠিকাদের মানিয়ে নেবার শিক্ষা দেয়। সুধীন্দ্রনাথের লক্ষ্মী প্রতিবাদী ও বলিষ্ঠ। ভাষা সাধুভাষা হলেও গতিসম্পন্ন এবং গল্পের আন্তরিক ভাবকে ধরে রাখতে সক্ষম। 'ছুটি' গল্পের দার্শনিকতা গল্পের চরিত্রকে ব্যাহত করেছে। সুধীন্দ্রনাথ গল্পের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শিশু মনের উপর গুত্ব দিয়েছেন বেশি 'পাড়াগেঁয়ে' গল্পে।

সে সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিদ্যুতের মতো তাঁর কোন কোন গল্পকে চমকিত করলেও তিনি ছিলেন মূলতঃ গার্হস্থ- জীবনের গল্পকার। কোন কোন গার্হস্থ্য জীবনের দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে তিনি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। স্বামী-স্ত্রী জীবনের মূলে যে সামন্তবাদ, ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণার ও বুর্জোয়াবাদের সঙ্কট

দেখা দিয়েছিল সে সময়, তার মৌল দ্বন্দ্বগুলোকেই তিনি উপস্থাপন করেছেন পুষ শাসিত গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনীগুলিতে । মধ্যবিত্ত ও উঁচু মধ্যবিত্তের পরাধীন জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যাকে তিনি অনুভব করেছেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে । আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন জীবনে প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, স্বাধীনচেতনা, বাৎসল্য এসব মূল্যবোধগুলি মানুষ হারালে পারিবারিক জীবনে সঙ্কট দেখা দিতে বাধ্য । উঁচু মধ্যবিত্ত সমাজের সাথে বন্ধনমুক্ত ভদ্রেতর জীবনের সমস্যাগুলোকেও তিনি এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার করেছেন । যে ধর্মীয় প্রভাব সামন্তবাদকে সমাজে টিকিয়ে রাখে, সেই ধর্মীয় অবস্থানের বিদ্ধেও সধীন্দ্রমাথ কলম ধরেছেন । তাছাড়া পরাধীন সমাজব্যবস্থা ও উপনিবেশীয় আর্থিক বন্ধন থেকে মানুষ কি করে তার ব্যক্তিগত স্বাধীন মনোভাবগুলোকে বিকশিত করতে পারে, সুধীন্দ্রনাথের কোন কোন গল্পে তারই ইঙ্গিত বহতা লক্ষণীয় । এদিকে ইংরেজ শাসন আর্থিক শোষণ ও পরাধীনতা এবং অপরদিকে ধর্মীয় প্রভাব ও অনুশাসন সেকালের সমাজ-জীবনে স্বাধীন মনোভাবের বাঁধাস্বরূপ ছিল । এই বাঁধা ডিঙোতে হলে হয় সংগ্রাম নতুবা সমন্বয়ের পথে যেতে হয় । প্রতিবাদী চৈতন্য থাকা সত্ত্বেও সধীন্দ্রনাথকে অবশেষে সমন্বয়ের পথে যেতে হয় । সুধীন্দ্রনাথ কোন কোন গল্পের পরিণতিতে পজিটিভ দিক দেখাতে মা পেরে নায়ক বা নায়িকাকে নেরে ফেলেছেন বা সন্ন্যাসী করে দিয়েছেন যা সেকালের অনেক অধুনিক ছোট গল্পকারগণ করতেন । এমন কি রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীও এ কাজ থেকে বাদ যান নি । 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ গল্পিয়ে ছিলেন না । তিনি ছিলেন যথার্থ গল্প-শিল্পী । তাঁর গল্প বাস্তবতার ফটোগ্রফি হয়ে ওঠেনি ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য যে কৃষকবিদেরোহ ও শ্রমিক সংঘটিত হয়েছিল তার কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে না থাকলেও তিনি ঠাকুর পরিবারে এক ব্যতিত্রান্ত ছোটগল্পকার । প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী চৈতন্যের পূর্বাভাসের জন্য শুধু ঠাকুর পরিবারে কেন, বাঙলা সাহিত্যের পরিবারেও তিনি সতন্ত্র ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com